প্রথম আলো

তারিখ 15 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

৫৭ ধারায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষকের মামলা

নাগরিক সুরক্ষা

আলী রীয়াজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের একজন শিক্ষক তাঁর সহকর্মীর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ৫৭ ধারার আওতায় মামলা করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে, সামাজিক মাধ্যমে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা অভিযোগকারীর সম্মানের জন্য হানিকর বলে তাঁর কাছে মনে হয়েছে। এই খবর দেখার পর আমার মনে কিছু প্রশ্নের তৈরি হয়েছে, সেই প্রশ্নগুলো তুলে ধরার জন্য এই লেখা।

গোড়াতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খুলে বলা দরকার, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'ইন দ্য স্পিরিট অব ফুল ডিসক্লোজার'। এই বিভাগের সঙ্গে আমার যোগাযোগকে আমি আত্মিক বলে মনে করি। ১৯৭৮ সালে যখন বিভাগে প্রথমবারের মতো স্নাতক ডিগ্রি চালু হয়, আমার সৌভাগ্য হয়েছে সেই ব্যাচের শিক্ষার্থী হওয়ার। ১৯৮৩ সালে বিভাগ থেকে পাস করার এক বছরের কিছু বেশি সময় পরে আমি বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি। ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত শিক্ষা ছুটিতে থাকার পর আমি বিভাগে ফিরে দুই বছর শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করি। ১৯৯৫ সালে দেশের বাইরে চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ার পর এক বছরের মধ্যেই আমি সহকারী অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করি। ফলে এই বিভাগের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ১৮ বছরের; শিক্ষার্থী ও শিক্ষক হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ছিলাম ১০ বছর। বিভাগে যাঁদের শিক্ষার্থী ছিলাম পরে তাঁদের অনেকের সহকর্মী হওয়ার সুযোগ হয়েছে। ঢাকায় গেলে বিভাগে যাওয়ার, সেখানে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করি; অনেক শিক্ষার্থী আমার সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। সেই কারণে এই মামলার বাদী অধ্যাপক আবুল মনসুর আহমেদ এবং বিবাদী ফাহমিদুল হক—দুজনই আমার পূর্বপরিচিত। তবে ফাহমিদুল হকের সঙ্গে আমার একাধিকবার দেখা হওয়ার সুযোগ হয়েছে দেশে এবং দেশের বাইরে একাডেমিক সম্মেলনে।

দেশের বাইরে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সুযোগ আমার হয়েছে এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতাও আমার আছে। সেই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অভিযোগ জানানোর কোনো রকম প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা কি অনুপস্থিত যে একজন শিক্ষককে তাঁর একজন সহকর্মীর বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতে পুলিশের দ্বারস্থ হতে হলো? যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ বছর টানা বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যেকোনো সময়ই দুজন শিক্ষকের মধ্যে এমন পরিস্থিতির তৈরি হতে পারে যে তাঁদের পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ জন্য সাধারণত তিনটি প্রক্রিয়া থাকে। প্রথমত, অভিযোগকারী মনে করতে পারেন যে তিনি বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। তাহলে তাঁর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্যবিষয়ক অফিসের কাছে তিনি অভিযোগ করবেন; ওই অফিসের কর্মচারীরা আইনসংক্রান্ত বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশাসনিকভাবে অভিযোগের তদন্তের ব্যবস্থা করবেন। দ্বিতীয়ত, একজন মনে করতে পারেন যে তাঁর সহকর্মী কোনো না কোনোভাবে তাঁর একাডেমিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করেছেন বা ওই সহকর্মী প্রতিষ্ঠানের বা পেশার নৈতিকতা ভঙ্গ করেছেন (যাকে ইংরেজিতে বলা হয় এথিকস ভায়োলেশন) বা ওই সহকর্মীর বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ আছে; তখন তিনি এ নিয়ে অভিযোগ করবেন, যা সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সহকর্মীকে নিয়ে গঠিত কমিটির কাছে পেশ করা হয় এবং তাঁরা তদন্তের মাধ্যমে সেটার নিষ্পত্তি করেন। ওই নিষ্পত্তিতে সন্তুষ্ট না হলে অভিযোগকারী আদালতের শরণাপন্ন হতে পারেন। তবে সে ক্ষেত্রে তাঁকে অভিযোগ করতে হবে প্রধানত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেই। তৃতীয়ত, এমন হতে পারে যে একজন কর্মচারী এমন কাজ করেছেন, যা নৈতিকতাবিরোধী। তাহলে সেটা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো যেতে পারে, যাঁরা নিরপেক্ষভাবে আগে বিবেচনা করবেন এই অভিযোগের আদৌ কোনো ভিত্তি আছে কি না, এ কাজের জন্য সাধারণত নির্ধারিত একজনের দায়িত্ব থাকে, তিনি অন্যদের সাহায্য নেন। যদি অভিযোগের ভিত্তি থাকে, তবে এই মর্মে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব নীতি ও পদ্ধতি আছে, সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

যেহেতু ফাহমিদুল হকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের বিষয় হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক বিষয়কেন্দ্রিক ভিন্নমত প্রকাশ, সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পদ্ধতি, যদি তা থেকে থাকে, তা অনুসরণ না করার কারণ কী? অভিযোগকারী আবুল মনসুর আহমেদ মনে করেছেন যে তাতে তিনি সুবিচার পাবেন না? যদি তা-ও হয়, তাহলেও এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষে মামলা নেওয়ার আগে কেন এই সব পদ্ধতির প্রশ্ন উঠল না? গণমাধ্যমে পাওয়া তথ্যে আমি দেখতে পাই, এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। তাহলে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এ ধরনের কোনো পদ্ধতি ব্যবহারের চেয়ে অভিযোগকারীকে উৎসাহিত করতেই আগ্রহী হয়েছে? তেমনটি হলে তা হবে দুঃখজনক। কেননা তাতে প্রমাণিত হবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা কার্যকর করার চেয়ে ভিন্নভাবে মোকাবিলাকেই কর্তৃপক্ষ যথাযথ বলে মনে করেছে।

পদ্ধতিগত প্রশ্নের পরে আমার জানার বিষয় হচ্ছে যে আইনের আওতায় এই অভিযোগ আনা হয়েছে, সেটা নিয়ে। এই আইনের আওতায় কীভাবে বিভিন্ন ধরনের মানুষকে হেনস্তা করা হয়েছে এবং হচ্ছে তা সবার জানা। ২০১৩ সালে এই আইনের সংশোধনীর পর থেকে এই আইন একাদিক্রমে ইসলাম-পসন্দ শক্তিগুলোর মন জোগানো, সরকারবিরোধীদের কণ্ঠরোধ, ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ কলহ নিষ্পত্তি, ইসলামপন্থীদের মোকাবিলা, জঙ্গিবাদ বিরোধিতা, জঙ্গিবাদ প্রসারের প্রমাণ তৈরি, বন্ধুরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কহানি প্রতিরোধ, ব্যক্তিগত রেষারেষি—সব কাজেই 'কার্যকরভাবে' প্রযুক্ত হয়েছে। এমনকি ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানি এবং সংক্ষুব্ধ হওয়ার আইনি কোনো রকম কারণ না থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিরাও তা ব্যবহার করেছেন। এটি একটি 'সর্ব রোগহর বটিকা'য় পরিণত হয়েছে। এসব ব্যবহারের দিকে তাকিয়ে কেউ কেউ একে 'আইনের অপপ্রয়োগ' বলে বর্ণনা করেন। আমি তাঁদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করি এই কারণে যে, এ ধরনের আইনের উদ্দেশ্যই হয় তার সর্বব্যাপ্ত ব্যবহার। ২০০৬ সালে আইন প্রণয়ন এবং ২০১৩ সালে সংশোধনীর সময়ে এর চেয়ে ভিন্ন কিছু উদ্দেশ্য ছিল না।

সম্প্রতি তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু সুস্পষ্ট করেই বলেছেন যে ধর্ম এবং রাষ্ট্রের পবিত্রতা রক্ষাই এই আইনের উদ্দেশ্য। <http ://www.newagebd.net/article/19670/index.php> ১৩ জুলাই ২০১৭)। ইদানীং এই আইন, বিশেষ করে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার পর এ নিয়ে অনেকেই সোচ্চার হয়েছেন। সম্ভবত আরেকটি কারণ হচ্ছে এই যে, সরকার ৫৭ ধারা বাতিলের কথা ভাবছে, ফলে এই সুযোগে নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে প্রতীয়মান করার জন্যও অনেকেই এ বিষয়ে কথা বলছেন। অথচ এর বদলে যে আইন ও ধারা অত্যাসন্ন, তা এর চেয়ে কোনো অংশেই কম বিপদের বিষয় নয় (কামাল আহমেদ, 'মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় ৫৭=১৯', *প্রথম আলো*, ১২ জুলাই ২০১৭)।

আমরা এ-ও জানি, এই ধারায় ফাহমিদুল হক প্রথম অভিযুক্ত ব্যক্তি নন, এমনকি অভিযুক্ত প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও নন। ব্যক্তিগতভাবে যে কেউ এই আইনের সমর্থক হতেই পারেন; কিন্তু যে আইন মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী, সেই আইন কেন একজন শিক্ষক তাঁর সহকর্মীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে উৎসাহী হবেন, সেটা আমার বোধগম্য নয়। এ থেকে কি শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেও মতপার্থক্যকে যুক্তিতর্ক, আলোচনা দিয়ে মোকাবিলা না করে রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে মোকাবিলা করা দরকার? গণমাধ্যমের জন্য এই শিক্ষার ফল কী হতে পারে, তার উদাহরণ সাম্প্রতিককালের ঘটনায় ইতিমধ্যে সহজেই দৃশ্যমান, এ ঘটনা তাতে বৈধতার সিলমোহর আরোপ করল বলেই আমার ধারণা। ভবিষ্যতে শিক্ষকদের লাউঞ্জে বা ক্লাবের আলোচনার কারণে এ ধরনের মামলা হবে না তার কি কোনো নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারেন?

বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ভিন্নমত পোষণের ও প্রকাশের পথ ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্যভাবে সীমিত হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এই বড় অংশ শিক্ষা এবং শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিষয়ে যতটা না উৎসাহী, তার চেয়ে বেশি উৎসাহী তাঁদের নিজেদের পছন্দের রাজনৈতিক দলের প্রতি তাঁদের সমর্থন প্রকাশে। অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের প্রার্থীদের পরিচিতি কী করে বিভিন্ন দলের পরিচয়ে হতে পারে? এগুলো মোটেই নতুন কথা নয়। শিক্ষকদের দলীয় আনুগত্যের ধারাকে গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেওয়ার পরিণতির বিষয়ে আমার উদ্বেগ আমি আগেও বলেছি ('আকাশ ভেঙে পড়েনি,' *প্রথম আলো*, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫)। কিন্তু তাই বলে একে কার্পেটের নিচে ঠেলে দেওয়াও বিবেচকের কাজ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতিগত বিষয়, কণ্ঠরোধী আইনের উপস্থিতি ও ব্যবহার এবং এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সম্মতি—সেটা কেবল এ ক্ষেত্রেই নয়, সবারই বিবেচনায় নেওয়া দরকার।

ফলে একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে আরেকজন শিক্ষকের অভিযোগকে কেন্দ্র করে আমার প্রশ্নগুলো অভিযোগের বিষয়বস্তু নিয়ে নয়; বরং প্রশাসনিক পদ্ধতিগত দুর্বলতার এবং এর ভেতরে বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজের যে ছবি দৃশ্যমান, সেই বিষয়ে। কিন্তু এটাও ঠিক যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়; সমাজে যে অসহিষ্ণুতা এবং ভিন্ন চিন্তার ব্যাপারে যে অশ্রদ্ধা বিরাজমান, তারই লক্ষণ আমরা এখানে দেখতে পাই। সেগুলো নিয়ে কথা বলা, সেগুলো প্রতিরোধ করার আর কোনো বিকল্প নেই।

● **আলী রীয়াজ : যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের অধ্যাপক।**